প্রসঙ্গ : ঈশ্বরের মাতৃরূপ

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, প্রত্যেক নারীই জগজ্জননীর অংশস্বরূপিণী। নারীর মধ্যে তিনি মা আনন্দময়ীকে দেখতেন–সে নারী যে জাতির, যে ধর্মের, যে চরিত্রের হোক না কেন। তিনি বলতেন, মাতৃভাব জগতের সর্বাপেক্ষা শুদ্ধ ও কল্যাণকর ভাব। তাঁর সর্বপ্রধান শিষ্য এবং সর্বোত্তম বাণীবাহক ও ভাষ্যকার স্বামী বিবেকানন্দও বলেছেন, নারীর সর্বোচ্চ আদর্শ জননী। তিনি বলতেন, যে হস্তদ্বয় শিশুকে দোল দেয়, তাতেই ভগবানের প্রথম প্রকাশ। পৃথিবীর প্রথম আলোক দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে মানব যাঁকে প্রথম দর্শন করে তিনি তার জননী। তাই বোধহয় মানবশিশুর কণ্ঠ–উৎসারিত প্রথম শব্দও 'মা'। একমাত্র মায়ের সঙ্গেই মানবের নাড়ির সম্পর্ক। এটি যেমন জৈবিক (biological) অর্থে সত্য, তেমনি সত্য মানসিক (mental), মনস্তাত্ত্বিক (psychological) এবং আধ্যাত্মিক (spiritual) অর্থেও। সব অর্থেই মানুষ মায়ের সঙ্গেই সর্বাপেক্ষা নিকট সম্পর্কে সম্পর্কিত। সেকারণে জন্মলগ্ন থেকেই মানব চরিত্রের ওপর মায়ের প্রভাব জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে অধিক পরিমাণে ক্রিয়াশীল থাকে। মায়ের ওপরেই মানবশিশুর সর্বাধিক নির্ভরতা, মা–ই তার পরম বিশ্বস্ত জন। যখন সে ভয় পায় তখন সে মাতৃঅঙ্কেই আশ্রয় খোঁজে যখন তার আনন্দ হয় সে সর্বপ্রথম সেই আনন্দের ভাগীদার করতে চায় মাকেই। দুঃখে অথবা আনন্দে মায়ের মঙ্গলহস্তই তাকে দেয় পরম স্বস্তি অথবা বাঞ্ছিত তৃপ্তি। মায়ের সঙ্গে মানবের এই সম্পর্কের জন্যই দেখা যায়, মা যখন শিশুসন্তানকে দুষ্টামির জন্য প্রহার করেন তখন চোখের জলে ভাসতে ভাসতে, আঘাতে জর্জরিত হতে হতে মাকেই সে জড়িয়ে ধরে। কারণ, জন্মলগ্ন থেকেই তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তাকে বুঝিয়ে দিয়েছে, যে–হাত তাকে আঘাত করছে সেই হাতই আবার পরক্ষণে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরবে, যে–চোখ এবং মুখ সে এতক্ষণ ক্রোধে জ্বলতে দেখেছিল, সেই চোখই কয়েক মুহূর্ত পরে জলে ভাসবে এবং সেই মুখই তার অশ্রুলিপ্ত মুখকে চুম্বনে চুম্বনে ভরিয়ে দেবে। বস্তুত, মানুষ যাকে সর্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসে বা শ্রদ্ধা করে, অথবা যাকে সর্বাধিক ভালবাসা বা শ্রদ্ধা অর্পণ করতে চায় তার মধ্যে সম্ভবত সে অজ্ঞাতসারে নিজের মাকেই দেখতে চায়। এটিই মানুষের সহজাত মনস্তত্ত্ব। মানব–ইতিহাসের উষালগ্নে মানব যখন ঈশ্বরের শরণাপন্ন হয়েছিল তখনো তার ভাবনায় এই মনস্তত্ত্বটি ক্রিয়াশীল ছিল।

ধর্মতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব এবং নৃতত্ত্ব বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের গবেষণা কি বলবে জানি না, তবে আমাদের মনে হয়, মানুষ যখন উচ্চতর বা ঊর্ধ্বতর কোন অ–লৌকিক অথবা অতি–প্রাকৃত শক্তির প্রথম কল্পনা

করেছিল তখন তাকে নারী হিসেবেই সে ভেবেছিল। মানব-ইতিহাসে ঈশ্বর ধারণার সেই সূচনা। বলা বাহুল্য, মানুষের নয়ন সম্মুখে নারীর যে-রূপটি তখন ভেসে উঠেছিল তা ছিল স্বাভাবিকভাবেই তার আপন গর্ভধারিণীরই মহত্তর রূপকল্প। অর্থাৎ, মানুষের চিন্তায় ঈশ্বর সম্ভবত মাতৃরূপেই প্রথম কল্পিত হয়েছেন।

আমরা যে নিছক কল্পনায় পক্ষবিস্তার করে এরূপ সিদ্ধান্ত করছি তা নয়। মানব সভ্যতার প্রাচীনতম সাহিত্য বা মানবের প্রাচীনতম লিপিবদ্ধ ইতিহাস ঋগ্বেদে আমরা এর সমর্থন পাচ্ছি। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের দশম অনুবাকের একশ পঁচিশতম সূক্তটি 'দেবীসূক্ত' নামে প্রসিদ্ধ। মানব সভ্যতার পূর্বাহ্নে উচ্চারিত এই সূক্তে আমরা ঋষি অম্ভৃণের কন্যা ঋষি বাকের উপলব্ধির সঙ্গে পরিচিত হই। ঋষি বাক্ উপলব্ধি করেছেন : জগৎপ্রপঞ্চের পশ্চাতে জগৎকারণরূপে যিনি অবস্থান করছেন, যাঁর অঙ্গুলিহেলনে বা ইচ্ছানুসারে সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রাদি পরিচালিত হচ্ছে, যাঁর প্রভাব ব্যতিরেকে রুদ্র জ্যা-রোপণে অসমর্থ, ব্রহ্মাণ্ডের সকল কিছুর মধ্যে যিনি ওতপ্রোতভাবে অনুস্যূত ও পরিব্যাপ্ত এবং তদতিরিক্ত হয়ে বিদ্যমান, তিনি একজন নারী। তিনিই জগতের ঈশ্বরী-আদ্যাশক্তি। সর্বদেশে সর্বকালে সুরনরাদি তাঁরই আরাধনা করে। দেবীসূক্তের পর 'রাত্রিসূক্ত'। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের দশম অনুবাকের একশ সাতাশতম সূক্তটিই বিখ্যাত রাত্রিসূক্ত। এই সূক্তে তৎকালীন মানুষের যে-পরিচয় আমরা পাচ্ছি সে-মানুষ হিংস্র প্রাণী ও দুর্ধর্ষ দস্যুদের পীড়নে আর্ত এবং সন্ত্রস্ত, শত্রু (অসুর?) কর্তৃক আক্রমণের আশঙ্কায় সদা উদ্বিগ্ন। শঙ্কাহীন নিরুদ্বেগ জীবন ও শত্রুনাশের জন্য সে তাই ব্যাকুলভাবে প্রার্থনাপর। স্মরণাতীত কালের আমাদের সেই অগ্রজদের প্রার্থনা কার কাছে? কার উদ্দেশে তারা নতজানু? রাত্রিসূক্তের ঋষি কুশিকের ভাষায়, তিনি হলেন সর্বব্যাপিনী, মৃত্যুঞ্জয়ী, তমোনাশিনী, শত্রুমর্দিনী, বিশ্ববিধাত্রী, বিশ্বত্রাত্রী, বিশ্বপ্রসবিত্রী জগৎপ্রকাশিকা আদ্যাশক্তি। ঋষি তাঁকে 'রাত্রি' নামে অভিহিত করেছেন। 'রাত্রি' শব্দের অর্থ, ভাষ্যকারদের মতে, অভীষ্টদাত্রী (রাত্রি = দদাতি অভীষ্টম্ ইতি রাত্রিঃ)। শুধু ঋগ্বেদেই নয়, সামবেদেও 'রাত্রিসূক্ত' আছে। সামবিধান ব্রাহ্মণের তৃতীয় মণ্ডলের অষ্টম অনুবাকের দ্বিতীয় সূক্তটি সামবেদোক্ত রাত্রিসূক্ত। সেখানেও সকল শক্তির সমষ্টিভূতা মহামায়ারূপে তিনি বর্ণিতা হয়েছেন তাঁরই প্রভাবে সূর্য, বায়ু, বরুণ, পৃথিবী স্ব-স্ব ভূমিকা পালন করে। অসুরবধার্থ পুন:পুন: অবতীর্ণ হয়ে তিনি জগৎকে রক্ষা করেন। সামবেদের ঋষি সেই আদ্যাশক্তির করুণা ভিক্ষা করছেন।

শুধু বৈদিক যুগেই নয়, প্রাক্-বৈদিক যুগেও মানুষ ঈশ্বরকে মাতৃরূপে উপাসনা করত। হরপ্পা এবং মহেঞ্জোদারোর ধ্বংশাবশেষ থেকে পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা সিন্ধু সভ্যতার যে-সমস্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাদি আবিষ্কৃত হয়েছে, তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, "দেবীই ছিলেন উক্ত দুই নগরের অধিবাসিগণের

প্রধান দেবতা।'' পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতাগুলি বিচার করলেও ঈশ্বরকে মাতৃরূপে উপাসনা করার প্রতি মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতার বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রবণতাটি মানব-মনে এমনই সহজাত যে, অদ্বৈতবেদান্তের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবক্তা আচার্য শঙ্করও একে অতিক্রম করতে পারেননি। তাঁর বিখ্যাত 'সৌন্দর্যলহরী' স্তোত্রটি এই প্রসঙ্গে স্মরণ করতে পারি। স্তোত্রটিতে জগজ্জননী আদ্যাশক্তির সমুচ্চ মহিমা কীর্তন করেছেন আচার্য। সেই মহিমার কী রূপ তা বোঝাবার জন্য উদাহরণস্বরূপ একটি স্তবক উপস্থাপন করা হলো :

''জগৎ সূতে ধাতা হরিরবতি রুদ্রঃ ক্ষপয়তে
তিরস্কুর্বন্নেতৎ স্বমপি বপুরীশঃ স্থগয়তি।
সদাপূর্বঃ সর্বং তদিদমনুগৃহ্লাতি চ শিব-
স্তবাজ্ঞামালম্ব্য ক্ষণচলিতয়োর্ভ্রূলত্।।''

-(হে জননি) তোমার সামান্য ভ্রূসঙ্কেত দ্বারা আজ্ঞা প্রাপ্ত হয়ে ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু তা রক্ষা করেন এবং রুদ্র (যথাসময়ে) তা লয় করেন। ঈশ্বর (যথাসময়ে) ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে স্ব-স্ব কার্য থেকে বিরত করে নিজ দেহে অর্থাৎ তত্ত্বে আত্মসাৎ করেন এবং সদাশিব (যথাসময়ে) ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র ও ঈশ্বরকে পুনরায় অনুগৃহীত করেন অর্থাৎ সৃজন, পালন, সংহার ও তত্ত্বে ধারণরূপ কার্যে নিয়োগ করেন।

আচার্য স্তোত্রটির সূচনায় বলছেন :

''শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুং
ন চেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি।
অতস্ত্বামারাধ্যাং হরিহরবিরিঞ্চ্যাদিভ
প্রণন্তুং স্তোতুং বা কথমকৃতপুণ্যঃ প্রভবতি।।''

-(হে জননি) শিব যদি শক্তিযুক্ত হন তবেই তিনি প্রভাবশালী হয়ে তাঁর কাজ করতে সমর্থ হন, অন্যথা তিনি স্বয়ং স্পন্দিত হতেও অসমর্থ। এই হেতু ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরাদি সকল দেবতা তোমার আরাধনা করেন। (এই পরিপ্রেক্ষিতে) আমার মতো অকৃতপুণ্য ব্যক্তি কিরূপে তোমাকে প্রণাম করতে বা তোমার স্তব করতে সমর্থ হবে?

এইক্ষেত্রে কেন উপনিষদের উমা-হৈমবতী প্রসঙ্গটি স্মরণীয়।

আচার্য শঙ্করের সমগ্র জীবন ও কর্মসাধনা অদ্বৈততত্ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যই সম্পূর্ণরূপে নিবেদিত। ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কোনকিছুর অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করতেন না। কথিত আছে, পরে তিনি শক্তির প্রভাব উপলব্ধি

করেছিলেন এবং ‘সৌন্দর্যলহরী’ প্রভৃতি নানা স্তব–স্তোত্রাদি সেই উপলব্ধিরই ফলশ্রুতি। কেউ কেউ অবশ্য মনে করেন যে, শক্তি বা অন্যান্য দেবদেবীর স্তব–স্তেত্রাদি শঙ্করের রচনা নয়, ওগুলির রচয়িতৃত্ব তাঁর ওপর আরোপ করা হয়েছে। এই মত সত্য হলে ‘শক্তি ব্যতিরেকে শিব বা ব্রহ্ম সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়াদি সমুদয় কর্মে অসমর্থ’–সৌন্দর্যলহরীতে আচার্য কথিত শক্তির এই সমুচ্চ মহিমা নিরর্থক হয়ে যায়। কিন্তু যার রচয়িতৃত্ব নিয়ে কোন সন্দেহ নেই, সেই ব্রহ্মসূত্রভাষ্যেও (১।৪।৩) আচার্য ঐ একই অভিমত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করেছেন–

“নহি তয়া বিনা পরমেশ্বরস্য স্রষ্টৃত্বং সিধ্যতি, শক্তিরহিতস্য তস্য প্রবৃত্ত্যনুপপত্তে।”

–শক্তি ভিন্ন পরমেশ্বরের স্রষ্টৃত্ব নিশ্চিতভাবেই সিদ্ধ হয় না। কারণ, শক্তিরহিত পরমেশ্বরের সৃষ্ট্যাদি কর্মে প্রবৃত্তি যুক্তিসঙ্গত নয়।